চিতা বহ্নিমান

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক
জিয়াউল হাসান নিয়াজ

প্রচ্ছদ
রুদ্র কায়সার

প্রকাশনী
প্রিমিয়াম পাবলিকেশন্স

বইমেলা পরিবেশক
নয়া উদ্যোগ

প্রিমিয়াম পাবলিকেশন্স
বাবুগঞ্জ বরিশাল

তপতী বড় হইয়া উঠিল।

মেয়েদের বিবাহের বয়স সম্বন্ধে আধুনিক যুগে অবশ্য কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই, তথাপি একমাত্র কন্যার বিবাহটা একটু শীঘ্রই দিবার ইচ্ছা মিঃ শঙ্কর চ্যাটার্জির। সম্বন্ধও পাকা এবং দিনও স্থির হইয়া গিয়েছে। বাকি শুধু বিবাহটার।

তপতী এবার বি-এ পরীক্ষা দিবে, তাহারই জন্য ব্যস্ত সে। বিবাহের নামে বাঙালী মেয়েরা যেরূপ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে তপসীর তাহা কিছুই হয় নাই। কেন হয় নাই, জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিবে—বাপ-মা'র হাতের দেওয়া অনিবার্য শাস্তি যখন লইতেই হইবে, তখন ভাবিয়া লাভ কি! বিয়েটা হইয়া গেলেই আনন্দ-বা-নিরানন্দ যাহোক একটা করা যাইবে। এখন পরীক্ষার পড়াটা করা যাক্।

কিন্তু ইহাতে ভাবিবার কিছুই নাই। তপতীর জন্য ভদ্রবংশের জনৈক শিক্ষিত এবং সুন্দর যুবক প্রস্তুত হইতেছেন। আর তপতী তাঁহাকে দেখিয়াছেও। বিবাহের পর যুবকটিকে বিলাত পাঠানো হইবে পূর্তবিদ্যা শিখাবার জন্য, ইহাই মিষ্টার এবং মিসেস চ্যাটার্জির ইচ্ছা।

এই তপতী—শিক্ষিতা, আধুনিকা এবং প্রগতিবাদিনী। উহাকে লাভ করিবার জন্য সোসাইটির কোন্ যুবক না সচেষ্ট। দিনের পর দিন তপতীকে ঘিরিয়া তাহারা গুঞ্জন তুলিয়াছে, গান করিয়াছে, গবেষনা করিয়াছে তপতীর ভবিষ্যত লইয়া। হ্যাঁ, তপতী অনিন্দ্যা, অনবদ্যাঙ্গী, অসাধারণীয়া। কিন্তু এহেন তপতীকে লাভ করিবে মাত্র একজন, ইহা সহ্য করা অপরের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু উপায় কি, ধনী পিতা তাহার, যাহাকে উপযুক্ত মনে করিবেন, তাহারই হাতে কন্যা দান করিবেন। অপরের তাহাতে কি বলিবার থাকিতে পারে।

মিঃ চ্যাটার্জির 'তপতী-নিবাস' নামক নবনির্মিত বিশাল প্রাসাদে মহাসমারোহে বিবাহদ্যোগ চলিতেছে। বর এখানো আসিয়া পৌঁছায় নাই, কিন্তু বরযাত্রীগণ প্রায় অনেকেই আসিয়াছেন এবং খাইতেছেন। রাত্রি প্রায় দশটা, অতি মলিন বেশ ছেঁড়া একটা কামিজ গায়ে মাথার চুল সম্পূর্ণভাবে মুণ্ডিত একটি যুবক আসিয়া মিঃ চ্যাটার্জিত সহিত দেখা করিতে চাহিল। বিবাহ সভায় এরূপ অতিথি কেই বা পছন্দ করে! কিন্তু যুবক দেখা করিবেই।

মিঃ চ্যাটার্জি কন্যা সম্প্রদানের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তথাপি যুবাকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে নিজেই খাসকামরায় নামিয়া আসিলেন।

একখানি জীর্ণ দলিল বাহির করিয়া যুবক বলিল,—আমার বাবার বাক্সে এই দলিলখানি পেয়েছি, এটা আপনার—আর সম্ভবত দরকারী। দয়া করে গ্রহণ করুন। মিঃ চ্যাটার্জি বিস্মিত হইয়া বলিলেন;—তুমি মহাদেবের ছেলে? এত বড়ো হয়েছ! বসো বাবা, আজ আমার মেয়ের বিয়ে, এখানেই খেয়ে যাবে।

—আমার কিন্তু অন্যত্র কাজ ছিল। যুবক সবিনয়ে জানাইল।

—তা থাক, কাজ অন্যদিন করবে, বসো।

মিঃ চ্যাটার্জি দলিলখানি গ্রহণ করিলেন। সত্যই দরকারী দলিল। যুবককে আর একবার বাসিতে অনুরোধ করিয়া তিনি ভেতরে গেলেন।

বর আসিয়াছে এবং বরের পিতা তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। মিঃ চ্যাটার্জি আসিতেই তিনি বলিলেন,—

—পণ-এর টাকাটা আমায় দিন, তারপর ছেলে আপনার, যা-খুশি করবেন তাকে নিয়ে।

—হ্যাঁ, বেয়াই-মশাই, কাল পরশুই আপনার টাকাটা দিয়ে দেবো।

—কেন? আজই দিয়ে ফেলুন না! ছেলেতো আমি বেচেই দিচ্ছি। নগদ কারবারই ভালো।

—এ রকম কথা কেন বলছেন বেয়াই-মাশাই। মিঃ চ্যাটার্জি অত্যন্ত আহত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

—বলছি যে আমায় যে নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা দেবার কথা সেটা দিয়ে ছেলেকে আপনার নিজস্ব করে নিন, আমি নগদ কারবারই ভালবাসি।

—কিন্তু আজই তো দেবার কথা নয়। আর এই রাত্রে অত টাকা কি করে দেওয়া যাবে বলুন! নগদ টাকাটা কাল নিলে কি ক্ষতি হবে আপনার!

—ওসব চলবে না চাটুজ্যেমশাই , টাকা না পেলে আমি পাত্র উঠিয়ে নিয়ে যাবো।

—উঠিয়ে নিয়ে যাবেন?

বিরাট বিবাহ সভা স্তম্ভিত হইয়া গেল। সভ্য, শিক্ষিত সমাজে এরূপ একটা কাণ্ড ঘটিতে পারে, কেহ কল্পনাও করে নাই। মিঃ চ্যাটার্জি রুদ্ধ-রোষ দমন করিয়া বলিলেন—আচ্ছা, যান উঠিয়ে নিয়ে, টাকা দেবো না।

—হেমেন—চলে এসো—বলিয়া বরকর্তা ডাক দিলেন। বর তৎক্ষণাৎ সুড়সুড় করিয়া উঠিয়া আসিল। বরকর্তা মিঃ চ্যাটর্জিকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন—ফাঁকি দিয়ে বিয়েটি সেরে নিয়ে কাল উনি আমায় কলা দেখাবেন। ওসব চলবে না, চাটুজ্যেমশাই, আমার পণ-এর টাকাটা ফেলে দিয়ে মেয়ে জামাই নিয়ে যা ইচ্ছে করুন! আপনি তো ধনী, টাকাটা না-দেবার কি কারণ থাকতে পারে?

—টাকা দেবো না! মিঃ চ্যাটার্জি সরোষে বলিয়া উঠিলেন।

—আচ্ছা, তাহলে—হেমেন চলে এসো!

বর ও বরকর্তা উঠিয়া গেলেন। সভাস্থ সকলে "আঃ কি করেন ঘোষাল মশাই, বসুন," বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু মিঃ চ্যাটার্জি দারোয়ানকে ডাকিয়া বলিলেন,—ওঁরা বেরিয়ে গেছেন? বেশ, গেট বন্ধ করে দাও আর যেন না ঢোকেন।

সকলে অবাক হইয়া গেল। মিঃ চ্যাটার্জি খাসকামরায় আসিয়া ডাকিলেন—তোমার বিয়ে এখনো হয়নি তো বাবা?

—আজ্ঞে না। কেন?

—এসো তোমার বাবার সঙ্গে আমার কথা ছিল, তোমাকে আমার জামাই করবো। এতদিন ভুলে ছিলুম, তাই ঈশ্বর আজ ঠিক দিনটিতে তোমায় পাঠিয়েছেন। এসো বাবা।

—আমি? আমি কি আপনার মেয়ের যোগ্য?

—নিশ্চয়! তুমিই তার যোগ্য।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে অসামান্যা সোসাইটি গার্ল তপতী চ্যাটার্জির সহিত এক নিতান্ত দীনহীন ব্রাহ্মণ যুবকের বিবাহ হইয়া গেল।

তপতীর পুরুষ বন্ধুরা, যাহারা কৌশলে এই বিবাহ পণ্ড করিবার জন্য ঘোষাল মহাশয়কে টাকা চাহিতে বলিয়াছিল, বুঝাইয়াছিল, যে মিঃ চ্যাটার্জির মতলব ভাল নয়।—তাঁহারা নীরবে দাঁড়াইয়া দেখিল, তপতীকে গ্রহণ করিবার জন্য তাহাদের কাহাকেও ডাকা হইল না। সব আশায় তাহাদের ছাই পড়িল দেখিয়া তাহারা মুণ্ডিত মস্তক, রৌদ্রদগ্ধ গোবেচারী বরের মুণ্ডপাত করিয়া ঘরে ফিরিল। কিন্তু নিশ্চিন্ত রইল না।

পরদিন সকালে কুশণ্ডিকার পর বরকে জিজ্ঞাসা করা হইল—বাবাজি কতদূর পড়াশুনা করছো? উত্তরে তপনজ্যোতি জানাইল, অকালে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় স্কুল হইতে তাকে বিদায় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। অবশ্য নিজে বাড়িতে সে

তাহার পর যৎকিঞ্চিৎ লেখাপড়ার চর্চা করিয়াছে। পিতৃবিয়োগের পরবৎসরই মাতৃবিয়োগ হওয়ায় সে অনাথ হইয়া নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। সম্প্রতি গয়ায় পিতৃতর্পণ শেষ করিবার সময় পিতার বাক্সের কাগজপত্রাদি নদীর জলে বিসর্জন দিতে গিয়া মিঃ চ্যাটার্জির দলিলখানি দেখিতে পায় এবং উহাই তাহাকে এখানে আসিতে বাধ্য করে।

শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেল। তপতী চ্যাটার্জির মতো সুন্দরী শিক্ষিতা বি-এ পড়া মেয়ের এই কি উপযুক্ত বর! মেয়েরা নাসিকা কুঞ্চিত করিলেন, পুরুষেরা সান্ত্বনার সুরে বলিলেন, যা হবার হয়ে গেছে—ওকে তো আর চাকরী করতে হবে না। সই করতে পারলেই চলে যাবে। তপতীর সমবয়সী বন্ধুগণ সামনে সহানুভূতি জানাইয়া অন্তরালে বলিল,—আচ্ছা হয়েছে! যেমন অহঙ্কারী মেয়ে!

তপতী নিজে কিছুই বলিল না। গত রাত্রে ব্যাপারটার আকস্মিকতা তাহাকে প্রায় বিহ্বল করিয়া দিয়াছিল। ভাবিতে ভাবিতে কখন সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, বরের সহিত আলাপ করা হইয়া উঠে নাই। পিতা তাহাকে নিশ্চয়ই অযোগ্যের হাতে দিবেন না, এই বিশ্বাসই তাহার ছিল, আজ কিন্তু সমস্ত শুনিয়া পিতার বিরুদ্ধে তাহার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। কিন্তু এখন আর কিছুই করিবার নাই।

মিঃ চ্যাটার্জি ও মিসেস চ্যাটার্জি দুঃখিত হইলেন। জিদের বসে তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহার জন্য অনুতপ্ত হইলেন, কিন্তু নিরুপায়ের সান্ত্বনা স্বরূপ তিনি ভাবিলেন, তাঁহার জামাতাকে তো কেরাণীগিরি করিতে হইবে না। নাইবা হইল সে বি-এ, এম. এ,পাশ। কন্যাকে ডাকিয়া তিনি শুধু বলিলেন, খুকী, তোর বাবার অপমানটা ও বাঁচিয়েছে, মনে রাখিস্।

খুকী তথাপি চুপ করিয়া রহিল এবং পরীক্ষার পড়ায় মনোযোগ দিবার জন্য পাঠগৃহে চলিয়া গেল।

তপনজ্যোতি জানাইল,—সে যেখানে থাকে তাহাদিগকে বলিয়া আসা হয় নাই, অতএব সে আজ যাইতেছে, আগামীকল্য সকালে ফিরিয়া আসিবে।

উৎসবগৃহ ধীরে ধীরে স্তিমিত হইয়া গেল।

ফুলশয্যার রাত্রে সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠের সংলগ্ন বারান্দায় একখানা সোফা পুষ্প-পত্র দিয়া সাজানো হইয়াছে। চন্দ্রালোকে তাহা স্নিগ্ধ হইয়া বর-বধূর অপেক্ষা করিতেছে।

তপনজ্যোতিকে আনিয়া সেখানে বসানো হইল। দুই চারজন রসিকা তাহার সহিত রহস্যালাপের চেষ্টাও করিল, কিন্তু তপনজ্যোতি বিশেষ কোন সাড়া দিল

না। সকলেই বুঝিল—পাড়াগাঁয়ের ছেয়ে, কথা কহিতে জানে না। বিরক্ত হইয়া সকালে চলিয়া গেল। তপনজ্যোতি তখন ভাবিতেছিল, যাহাকে সে বিবাহ করিয়াছে. কেমন সে, তপনজ্যোতিকে সে গ্রহণ করিতে পারিবে না। মন তাহার এতই উন্মনা হইয়া উঠিয়াছে যে অন্য কাহারও সহিত কথা বলা প্রায় অসম্ভব লইয়া পড়িয়াছে। অধীর চিত্তে সে বধূর অপেক্ষা করিতে লাগিল। সঙ্গিনীগণ তপতীকে হইয়া আসিল। তপনের হৃদয় নবোঢ়া বধূর মতোই দুরু দুরু করিয়া উঠিল। তপতী কিন্তু সঙ্গিনীগণকে দরজা হইতেই বিদায় করিয়া দিয়া ঘরে ঢুকিল এবং যে বারান্দাটুকুতে বর বসিয়াছিল, তাহার ও ঘরের মধ্যকার দরজাটি সজোরে বন্ধ করিয়া দিয়া যেন তপনকে বুঝাইয়া দিল যে, শয়নকক্ষে বরের প্রবেশ নিষেধ।

কাচের সার্সির মধ্যে চাহিয়া তপন দেখিতে লাগিল, তপতী শয়নের বেশ পরিধান করিল; তারপর উজ্জ্বল আলোটা নিবাইয়া দিয়া স্নিগ্ধ নীল আলো জ্বালাইল এবং সটান শয্যায় লুটাইয়া পড়িল।

তপন স্তম্ভিত! অনেকক্ষণ পরে তাহার মনে হইল, হয়ত তপতী জানে না যে, সে এখানে বসিয়া আছে। ধীরে ধীরে সে রুদ্ধ দরজার বাহিরে করাঘাত করিয়া ডাকিল,—তপতী! দরজাটা খোল!

তপতী পিছন ফিরিয়া শুইয়াছিল। তেমনি ভাবেই জবাব দিল,—ঐখানেই থাকুন।

তপনের সমস্ত ইন্দ্রিয়াগ্রাম বিমূঢ় হইয়া আসিতে লাগিল। তবে তো তাহার আশঙ্কাই সত্য হইয়াছে। তপতী তাহাকে গ্রহণ করিবে না। তাহার পঞ্চবিংশ বর্ষের নির্মল নিষ্কলুষ প্রেমকে তপতী এমন দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করিল! কিন্তু কি কারণে! অর্থাভাবে সে কলেজে পড়িতে পারে নাই, কিন্তু পড়াশুনা সে যথেষ্টই করিয়াছে এবং এখনো করে। এই কথা সে আজ নিজে তপতীকে জানাইবে ভাবিয়াছিল, কিন্তু শুরুতেই তপতী তাহাকে এমনভাবে বাধা দিল যে কিছুই আর বলিবার উপায় রহিল না। নীরবে সে ভাবিতে লাগিল, তাহাকে গ্রহণ না—করিবার কি কি কারণ তপতীর পক্ষে থাকিতে পারে। সে ডিগ্রীধারী নয়, কিন্তু পড়াশুনা সে ভালই করিয়াছে এবং সে-কথা গতকল্য যতদূর সম্ভব জানাইয়াছে। অবশ্য আত্মশ্লাঘা করা তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তাই যথাসম্ভব বিনয়ের সহিত জানাইয়াছে। দ্বিতীয়, সে পল্লীগ্রামে জন্মিয়াছে কিন্তু সে তো শহরবাসের অভিজ্ঞতাও লাভ করিয়াছে। তৃতীয়, ব্রাহ্মণত্বের গোঁড়ামী তাহার একটু বেশি,

তপতী একথা মনে করিতে পারে—কিন্তু, বি-এ পড়া মেয়ের পক্ষে কাহাকেও কিছুমাত্র চিনিবার চেষ্টা না করিয়াই একটা বিরুদ্ধ ধারণা করা কি ঠিক! তপনের চেহারা এমন কিছুই খারাপ নয় যে তপতীর চক্ষু পীড়িত হইবে। বরং চেহারার প্রশংসাই তপন এযাবৎকাল শুনিয়াছে। তবে হইল কি?

স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নালোকে তপনের দুটি চক্ষু জ্বালা করিয়া উঠিল। জীবনের কত সাধ কত আশা আজই বুঝি চুর্ণ হইয়া যাইতেছে। তপনেরই অন্তর-বেদনা যেন শিশিরে শিশিরে ঝরিতেছে। কিন্তু এই গভীর বেদনাকে এত শীঘ্র বরণ করিয়া লইবে তপন! নাঃ—আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখা যাক। তপন বলিতে চাহিল,—ওগো, তুমি যাহা মনে করিয়াছ, তাহা আমি নহি,—আমায় সুযোগ দাও, আমি তোমার যোগ্য হইবার চেষ্টায় জীবনপাত করিব।

তপন পুনরায় উঠিয়া দেখিতে লাগিল, তপতীর শয্যালুণ্ঠিত সুকোমল দেহখানি। তপতী ঘুমাইয়া গিয়াছে। সুদীর্ঘ বেণী দুটি পিঠের উপর দিয়া নামিয়া কোমরের নীচে তলাইয়া গিয়াছে, যেন দুইটি কৃষ্ণকায় সর্প তাহাকে পাহারা দিতেছে। সুখসুপ্তির সুদীর্ঘ নিশ্বাস তপনকে জানাইয়া দিল—তপতী তাহার নহে, তাহার হইলে এত সহজে, এত নিরুদ্বেগে সে এমন করিয়া ঘুমাইতে পারিত না।

চকিতে তপনের মস্তিষ্কে একটা বিদ্যুৎচিন্তা খেলিয়া গেল। তবে, তবে হয়ত যাহার সহিত তপতীর বিবাহ হইল না, তাহকেই সে ভালবাসে—কিম্বা—ভাবিতে গিয়া তপন অন্তরে শিহরিয়া উঠিল। যুগসঞ্চিত হিন্দুসংস্কারে গঠিত তাহার মন যেন কোন অতল বিষসাগরে ডুবিয়া যাইতেছে। একি হইল। তাহার সুন্দর সুনির্মল জীবনে এ কার অভিশাপ! সে তো ইহা চাই নাই। ধনীর কন্যাকে বিবাহ করিবার লোভ তাহার কোনদিন ছিল না। কিন্তু যাক—তপন স্থির করিয়া ফেলিল, তপতীকে কিছুই সে বলিবে না। তাহার বাঞ্ছিতকে—যদি অবশ্য তপন ব্যতীত অপর কেহ তাহার বাঞ্ছিত হয়—ফিরিয়া পাইতে তপন সাহায্যই করিবে।

তপন সেই যে ভোরে উঠিয়া গিয়া তাহার জন্য নির্দিষ্ট কক্ষটিতে শয়ন করিয়াছে, বেলা বারটা বাজিয়া গেল, এখনো ওঠে নাই। প্রথমে সকলেই ভাবিয়াছিল, ইহা বধূর সহিত রাত্রি জাগরণজনিত অনিদ্রার আলস্য। কিন্তু তপতী দিব্যি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহার দেহমনে ক্লান্তির কোন লক্ষণ নাই দেখিয়া মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—হাঁরে তপন কখন ঘরে গিয়া শুয়েছে? এখনো উঠছে না কেন?

—আমি তার কি জানি। বলিয়া তপতী অন্যত্র চলিয়া গেল।

ইহাকে নবোঢ়ার লজ্জা মনে করিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিল। কিন্তু মা চিন্তিত মুখে তপনের ঘরে আসিয়া দেখিলেন,—গা অত্যন্ত গরম—তপন চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছে। প্রথম ফুলবাসরের পরেই জামাইয়ের জ্বর—আধুনিক সমাজের মধ্যে বাস করিয়াও তপতীর মা'র মনের সাধারণ বাঙালী মেয়ের সংস্কার ইহাকে অমঙ্গল-সূচক মনে করিল। ব্যগ্র ব্যাকুল ভাবে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—জ্বর কেন হলো বাবা? কখন থেকে হলো?

তপন চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিল, শিয়রে জ্যোতির্ময়ী জননীমূর্তি। তাহার চিরদিনের স্নেহবুভুক্ষু মন কাঁদিয়া উঠিল—

"স্নেহ-বিহ্বল করুণা ছলছল শিয়রে জাগে কার আঁখিরে"।

তপন বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, এই মা, আর ঐ তাঁর মেয়ে। ইহা অপেক্ষা বিস্ময়ের ব্যাপার তপন জীবনে আর দেখে নাই। স্নিগ্ধ শিশুকণ্ঠে সে উত্তর দিল—একটু ঠাণ্ডা লেগেছে মা, কিছু ভয়ের কারণ নাই, একটা দিন উপোষ দিলেই সেরে যাবে।

—ডাক্তার ডাকি বাবা। জননীর স্নেহ করপুট তপনের ললাটে নামিল।

—না মা ওষুধ আমি খাইনে—কিছু ভাবনা নেই আপনার। আমি কালই ভালো হয়ে যাবো মা—আপনার মঙ্গল হাতের ছোঁয়ায় অসুখ কতক্ষণ টিকতে পারে?

পুত্রবঞ্চিতা শিক্ষিতা জননী এমন করিয়া মা ডাক কোনদিন শুনেন নাই। অন্তর তাঁহার বিমল মাধুর্যে ভরিয়া উঠিল।

আপনার গর্ভজাত পুত্রের স্থানেই তিনি তপনকে সেই মুহূর্তে বরণ করিয়া লইলেন, বলিলেন—কি খাবে বাবা, সাবু?

—না মা, সাবু আমি খেতে পারি নে, বেঙাচির মতো দেখতে লাগে।

—আচ্ছা বাবা, একটু গ্লাক্সো দিই।

—শুধু একটু গরম দুধ দেবেন মা,—এ বেলা আর কিছু খাবো না। আর আমি একা শুয়ে থাকবো—আপনার খুকীর বন্ধুরা যেন আমায় জ্বালাতন না করে এইটুকু দেখবেন।

—আচ্ছা, তাদের বারণ করে দেবো।

মা চলিয়া গেলেন, তপন শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিল। কুলহীন পারহীন চিন্তা সমুদ্রে সে যেন তলাইয়া যাইতেছে। কিরূপে আত্মরক্ষা করিবে আজ? এ

যাবৎকাল সে নিজের জীবনকে যেভাবে গঠিত করিয়াছে তাহাতে তপতীকে বিবাহ করিবার পর অন্য কাহাকেও গ্রহণ করা তাহার কল্পনারও অতীত, অথচ তপতীকে পাইবার সমস্ত আশাই বুঝি নির্মূল হইয়া গেল? কিন্তু মা! আশ্চর্য ঐ মহিমাময়ী নারী উহার গর্ভে জন্মিয়াছে সে, যাহাকে গত রাত্রে তপন দেখিয়াছে। যে নিষ্ঠুরা নারী শীতের রাত্রে একজনকে বাহিরের বারান্দায় রাখিয়া নিশ্চিন্তে নিরুদ্বেগে ঘুমাইতে পারে! কিম্বা তপন ভুল দেখিয়াছে, সে ইঁহার কন্যা নহে। কিন্তু যতদূর মনে হয়, ইনিই মা এবং এই সংসারের কর্ত্রী। ইঁহারই কন্যা এত নিষ্ঠুর হইল কিরূপে? হিন্দুনারী হইয়াও আপনার স্বামীকে বুঝিবার চেষ্টা পর্যন্ত করিল না, বুঝাইবার সুযোগ পর্যন্ত দিল না। ইহার অন্তর্নিহিত রহস্য যতই ভীতিপ্রদ হউক, যেমনই কদর্য হউক, তপন তাহাকে আবিষ্কার করিবে। তারপর যথা কর্তব্য করা যাইবে।

ভাবিতে গিয়া তপন আতঙ্কিত হইয়া উঠিল।—যদি সে দেখে তপতী অন্যাসক্তা, তপতী তাহার অন্তরে অপরের মূর্তি আঁকিয়া পূজা করিতেছে—তপন কি করিবে? ভাবিতে গিয়া তপনের মনে হইল—হয়ত তাহাই সত্য, তপনকে তাহাই সহ্য করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে এবং তপতীকে সুযোগ দিতে হইবে তাহার বাঞ্ছিতকে লাভ করিবার জন্য। বর্তমানে ইহা অপেক্ষা আর অধিক কিছুই ভাবিবার নাই। যদি সত্যই সে কাহাকেও ভালোবাসে তবে তাহাকেই লাভ করুক। অন্যথায় তাহার কুমারী-হৃদয় একদিন তপনের কাছে ফিরিয়া আসিবে—সেই শুভদিনের জন্য অপেক্ষা করিবে তপন। যদি তাহাও না হয় তবে তপনের জীবন—সে তো চিরদিনই দুঃখের তিমির-গর্ভে চলিয়াছে, তেমনিই চলিবে।

ক্লান্ত তপন কখন এক সময় ঘুমাইয়া পড়িল।

শহরতলীর সর্পিল পথ ধরিয়া চলিয়াছে বিনায়ক। মন তাহার বিষাদখিন্ন। তার একমাত্র অভিন্ন বন্ধু তপনের অন্তরে বিষাক্ত কণ্টক বিদ্ধ হইয়াছে। সে কাঁটা তুলিয়া ফেলার উপায় বাহির করা সহজ নহে, কারণ তুলিতে গেলে তপনের হৃদপিণ্ডটিকে জখম করিতে হয়। বিনায়ক ভাবিতেছে আর চলিতেছে। দিকে দিকে বাসন্তী শ্রী ফুটিয়া উঠিতেছে; মাঘ মাসের শেষ হইয়া আসিল। সরস্বতী পূজা, কিন্তু পূজার শ্রেষ্ঠ পুরোহিত তপন আসিবে না। বিনায়কের মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল তপনের বিরুদ্ধে। কেন সে না দেখিয়া শুনিয়া বিবাহ করিতে গেল?